بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০৩ অক্টোবর, ২০২৫ মোতাবেক ০৩ ইখা, ১৪০৪ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হুনাইনের যুদ্ধের পর এতে অর্জিত গনিমতের সম্পদ এবং তা বণ্টনের বর্ণনা চলছিল। এ সম্পর্কে আরো কিছু ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে: মহানবী (সা.) হুনাইন জয়ের পর সমস্ত গনিমতের সম্পদ জিরানা নামক স্থানে একত্রিত করার আদেশ দেন। এই আদেশ দেবার পর তিনি (সা.) তায়েফ অভিমুখে যাত্রা করেন আর প্রায় এক মাস অবস্থানের পর তায়েফ থেকে ফিরে জিরানায় আসেন। সেখানে পৌঁছেও মহানবী (সা.) গনিমতের সম্পদ বণ্টন করেন নি, বরং আরো কিছু দিন অপেক্ষা করেছেন। কতিপয়ের মতে মহানবী (সা.) এই আশায় প্রায় তেরো বা চৌদ্দ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন যে, হয়ত বনু হাওয়াযিন গোত্র অনুপপ্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করবে আর তাদের পরিবার-পরিজন, ধনসম্পদ, গবাদি পশু তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মহানবী (সা.) এদিকে তাদের অপেক্ষায় ছিলেন আর অপর দিকে বনু হাওয়াযিন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল যে, আমাদের ফিরে যাওয়া আদৌ লাভজনক হবে কি-না? পরিশেষে মহানবী (সা.) এত দিন অপেক্ষার পর যখন দেখলেন তারা আর আসছে না, তখন তিনি গনিমতের সম্পদ এবং যুদ্ধবন্দিদের বণ্টন করে দেন। বণ্টন শেষ হবার পর হাওয়াযিন গোত্রের চৌদ্দোজন সম্মানিত ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়। তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা বলে, আমাদের পুরো গোত্রও ইসলাম গ্রহণ করেছে। এরপর তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে করুণা ভিক্ষা চেয়ে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা সম্ভ্রান্ত এবং সম্মানিত ব্যক্তি। যে বিপদাপদ এবং সমস্যায় আমরা জর্জরিত তা আপনার অজানা নয়। আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন; আল্লাহ্ তা'লা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করবেন। এই প্রতিনিধিদলের নেতা আবু সূরাত যুহায়ের বিন জারবেল ছিল। সে সুবক্তা ও কবি ছিল। সে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিমায় মহানবী (সা.)-এর সমীপে দয়ার অনুরোধ জানায় এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই বন্দিদের মাঝে আপনার ফুফুরা, খালারা এবং বোনেরাও আছেন- যারা আপনাকে লালনপালন করেছেন এবং পানাহার করিয়েছেন। সে একথা কেন বলেছে? কেননা মহানবী (সা.) বনু সা'দ গোত্রে দুগ্ধপানের কাল অতিবাহিত করেছেন আর সেখানেই লালিতপালিত হয়েছিলেন। তাঁর দুধ মাতা-পিতা বনু সা'দ গোত্রভুক্ত ছিলেন, যা বনু হাওয়াযিনের শাখা গোত্র ছিল। এরপর সে বলে, আমরা যদি দুধ পান করানোর অনুগ্রহের কথা গাস্সানী বাদশাহ্ হারেস বিন আবী শিমার বা ইরাকের বাদশাহ নু'মান বিন মুনযেরের কাছে ব্যক্ত করতাম আর আমরা এরূপ সমস্যায় জর্জরিত থাকতাম, তাহলে তারা আমাদের প্রতি অবশ্যই দয়া প্রদর্শন করত। অথচ আপনি তো সর্বাধিক দয়ালু এবং উদার ও মহানুভব। এরপর সে মহানবী (সা.)-এর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে একটি কাসীদাও শোনায়। সেই প্রতিনিধিদলে তাঁর দুধ চাচাও ছিলেন। তিনিও অনেকটা অনুরূপ মিশ্রআবেগে সজ্জিত বক্তৃতা করেন এবং এ-ও বলেন, আপনি যখন শৈশবকালে আমাদের কাছে ছিলেন তখনও আপনাকে দেখেছিলাম, আপনি অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন। এরপর আপনার যৌবনকালে আপনার সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হয়। যৌবনকালেও

কোনো ব্যক্তি আপনার চেয়ে বেশি পুণ্যপ্রকৃতির অধিকারী ও ভদ্রস্বভাবের ছিল না। আপনি তো কল্যাণের মূর্ত প্রতীক এবং বদান্যতার এক সমুদ্র। আমরা আপনার নিজের লোক এবং আপনারই পরিবারভুক্ত, তাই আমাদের প্রতি কৃপা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনার এই অনুগ্রহের প্রতিদান অবশ্যই দেবেন। মহানবী (সা.) তাদের বেদনাভরা মিনতি শোনেন এবং তাদের আবেদন নাকচ করেন নি, উপরন্তু তিনি বলেন, আমি অনেকদিন যাবৎ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করেছি আর অবশেষে প্রায় নিশ্চিত হলাম, এখন আর তোমরা ফেরত আসবে না। আর এখন তোমরা দেখছ, কেবল গুটিকয়েক বন্দিই আমার কাছে অবশিষ্ট আছে, বাকি সব বণ্টন হয়ে গেছে। আমার নিকট সবচেয়ে অধিক পছন্দনীয় বিষয় সেটিই যা সবচেয়ে বেশি সত্য। তাই এখন তোমরা দুটি বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বিষয় নির্বাচন করতে পারো; বন্দি নারী-পুরুষ অথবা ধনসম্পদ। এগুলোর মধ্যে যেটি নিতে চাও নিতে পারো। আমি তো তোমাদের জন্য অনেক অপেক্ষা করেছি এবং দুটোই ফেরত দিতে চেয়েছিলাম। বনু হাওয়াযিনের প্রতিনিধিদল সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এই নিবেদন করে যে, আমরা আমাদের বন্দি অর্থাৎ আমাদের নারী-পুরুষদের ফেরত নিতে চাই। একথা শুনে রসূলে করীম (সা.) বলেন, আমার এবং বনু আব্দুল মুত্তালিবের অংশে যে সকল বন্দিরা এসেছে, ধরে নাও তাদেরকে তোমরা পেয়ে গেলে, অর্থাৎ আমি তো তাদের স্বাধীন করে দিচ্ছি, তোমাদেরকে ফেরত দিয়ে দিচ্ছি; কিন্তু অন্যান্য বন্দির বিষয়ে আমি অন্য সকল মুসলমানের সাথে কথা বলব, কেননা তাদেরকে আমি ইতোমধ্যে দিয়ে দিয়েছি। একইসাথে প্রতিনিধিদলকে এ থেকে উত্তরণের, অর্থাৎ কীভাবে, কী করতে হবে– সেই পন্থাও বলে দেন। তিনি বলেন, তোমরা যোহরের নামাযের পর লোকদের সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, আমরা মুসলমানদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমাদের সুপারিশকারী বানাচ্ছি এবং মুসলমানদের কাছে রসূলে করীম (সা.)-এর দ্বারা সুপারিশ করাচ্ছি যে, আমাদের সন্তানসন্ততি ও আমাদের নারীদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। একইসাথে মহানবী (সা.) এ-ও বলেন যে, মুসলমানদের সামনে তোমাদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা প্রদান করবে এবং বলবে, আমরা তোমাদের ভাই; এরপর আমি লোকদের নিকট তোমাদের জন্য সুপারিশ করব; [অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি সুপারিশ করব।] মহানবী (সা.)-এর মহান উদারতা ও বদান্যতার একটি আকর্ষণীয় রূপ হলো, তিনি নিজেই বন্দিদের মুক্তির উপায় শিখিয়ে দিচ্ছেন যেন সাধারণ মুসলমানদের আত্মসম্মানবোধও বজায় থাকে, কেননা তখন তো বন্দিরা তাদের অধীনে চলে গিয়েছিল; এবং পাশাপাশি হাওয়াযিনের সম্মানও যেন অক্ষুণ্ন থাকে। প্রতিনিধিদল সেভাবেই যোহরের নামাযের পর দাঁড়িয়ে নিবেদন করে যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছিলেন। বুখারীর বর্ণনানুযায়ী রসূলে করীম (সা.) দাঁড়িয়ে লোকদের সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের ভাইয়েরা তওবা করে তোমাদের নিকট ফেরত এসেছে। আমি তাদের বন্দিদের তাদের ফেরত দিতে চাই, তোমরাও যারা স্বেচ্ছায় এরূপ করতে চাও করতে পারো। আর যে তাদের বিনিময়ে আমাদের নিকট থেকে কিছু নিতে চায়, সে এমনটিও করতে পারে। আমি কোনো মালে গনিমত হস্তগত হওয়ামাত্রই তার প্রাপ্য ফেরত দেবো। আর একইসাথে নিজের ও নিজ বংশ অর্থাৎ বনু আব্দুল মুত্তালিবের বন্দিদের ফেরত দেবার ঘোষণা প্রদান করেন। সাহাবায়ে কেরাম তো নিজেদের প্রাণ, স্ত্রী-সন্তান ও পিতা-মাতার চেয়েও মহানবী (সা.)-কে অধিক ভালোবাসতেন। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার সন্তুষ্টির খাতিরে আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের বন্দিদেরকে হাওয়াযিনকে ফেরত দিচ্ছি। মহানবী (সা.) তাদের এই আবেগ দেখে অনেক আনন্দিত হন, কিন্তু তিনি (সা.) সকলের সন্তুষ্টি ও স্বতঃস্ফূর্ততা সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান

করেন। তাই তিনি (সা.) বলেন, এটি বুঝা যাচ্ছে না, তোমাদের মধ্যে কে কে অনুমতি দিয়েছে আর কে কে দেয় নি। কেননা সাধারণ সভায় সবাই কথা বলছিল। তাই তোমরা এখন ফেরত যাও এবং তোমাদের নেতা ও তত্ত্বাবধায়কগণ আমার কাছে এসে নিজ জাতির অবস্থান তুলে ধরবে। তাঁর (সা.) এই কথার প্রেক্ষিতে সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের বন্দিদের ফেরত দেবার ঘোষণা করে এবং তাদের তত্ত্বাবধায়করা মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে এই অবস্থান বর্ণনা করে। আর এভাবে এই শত্রু গোত্রের প্রতি মহানবী (সা.)-এর এরূপ মহান অনুগ্রহ বর্ষিত হয়, অর্থাৎ সকল বন্দি কোনো প্রকার বিনিময় ছাড়াই ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। আর স্বীয় নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত প্রেমিক সাহাবীদের আবেগকে শ্রদ্ধা করে তিনি (সা.) বলেন, প্রত্যেক বন্দির বিনিময়ে ছয়টি করে উট দেওয়া হবে।

হযরত উমর (রা.)-র মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের নমুনা দেখুন। বন্দিদের মুক্ত করার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ফিরে আসার পর তিনি দেখেন, বন্দিরা আনন্দে উল্লসিত হচ্ছে অর্থাৎ বন্দিরা আনন্দে আত্মহারা। জিজ্ঞেস করে তিনি জানতে পারেন, মহানবী (সা.) সমস্ত বন্দি মুক্ত করে দিয়েছেন। তখন তিনি এটা শুনতেই কোনো প্রকার অনুসন্ধান ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন মনে করেন নি এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর পুত্রকে বলেন, হে আবদুল্লাহ! যাও এবং আমার সেই দাসীকে মুক্ত করে দাও যাকে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) আমাকে দান করেছিলেন।

মহানবী (সা.) বনু হাওয়াযিনের এই বন্দিদের যে শুধু কোনো বিনিময় ছাড়াই মুক্ত করে দিয়েছেন তা-ই নয়, বরং তাদেরকে তিনি পোশাকপরিচ্ছদও দান করেন এবং তিনি (সা.) জোর দিয়ে বলেন: فَلَا يَخْرُجُ الْحُرُّ مِنْهُمْ إِلَّا كَاسِيًا– অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেন নতুন পোশাক ছাড়া না যায়। সুতরাং এই আদেশ পালনার্থে নতুন কাপড় ক্রয়ের জন্য একজন সাহাবী বুসর বিন সুফিয়ানকে পাঠানো হয়। তিনি নতুন চাদর নিয়ে আসেন এবং প্রত্যেক বন্দিকে নতুন পোশাক দেওয়া হয়।

বর্ণনা অনুযায়ী, তিনজন এমন ছিল যারা তাদের বন্দি ফেরত দিতে অস্বীকার করে। আকরা বিন হাবিস বলে, আমার এবং বনু তামীমের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে আমরা অস্বীকার করছি। উয়াইনা বিন হিসন ফাযারী বলে, আমি এবং আমার গোত্র বনু ফাযারা অস্বীকার করছি। আর আব্বাস বিন মিরদাস বলে, আমি এবং বনু সুলাইম বন্দি ফেরত দেবো না। কিন্তু বনু সুলাইম গোত্র একথা শুনতেই তাদের নেতার কথা মানতে অস্বীকার করে এবং বলে, যা কিছু আমাদের– তা আমরা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে দিয়ে দিয়েছি।

অন্য কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, মহানবী (সা.) বলেন, বনু হাওয়াযিনের সমস্ত বন্দি মুক্ত আর যে তার বন্দি মুক্ত করতে চায় না তাকে এর বিনিময়ে বায়তুল মাল থেকে ছয়টি সবল উট ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া হবে। সুতরাং এতে সেই সকল লোকও রাজি হয়ে যায় যারা তাদের বন্দি দিতে প্রস্তুত ছিল না। এভাবে বনু হাওয়াযিনের ছয় হাজার বন্দি মুক্ত করে দেওয়া হয়।

কতক বর্ণনা অনুযায়ী, উয়াইনা বিন হিসন ফাযারী এরপরও তার বন্দি ফেরত দেয় নি। কিন্তু এই অবাধ্যতার কারণে তাকে চরমভাবে লজ্জিত হতে হয় এবং সে কল্যাণ ও বরকত থেকেও বঞ্চিত থাকে। বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.)-কে যখন জানানো হয়– উয়াইনা ছাড়া সবাই তাদের বন্দি ফেরত দিয়ে দিয়েছে, তখন তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তাকে ক্ষতির মাঝে রাখুন।

তার বন্দির ঘটনা হলো, সে যুবতী নারীর পরিবর্তে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে বন্দি হিসেবে নিয়েছিল এবং লোকজনের জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছিল, তার পরিবারের লোকেরা যখন তাকে অর্থাৎ এই বৃদ্ধাকে মুক্ত করতে আসবে তখন আমি তার জন্য ইচ্ছানুযায়ী মুক্তিপণ পাবো, কারণ তার সন্তানসন্ততি বিপুল সংখ্যক হবে। এখন যখন সকল বন্দি মুক্ত করে দেওয়া হয়, কিন্তু সে মুক্ত করতে অস্বীকার করে, তখন সেই বৃদ্ধার ছেলে উয়াইনার কাছে আসে এবং তাকে বলে, একশত উটের বিনিময়ে আমাদের মাকে মুক্ত করে দাও। উয়াইনা ভেবেছিল, সে দর আরো বৃদ্ধি করবে, তাই সে মুক্ত করতে অস্বীকার করে। এতে তার ছেলে ফিরে যায়। কিছুকাল পর যখন উয়াইনার মনে হলো, সে আর ফিরে আসবে না, তখন উয়াইনা নিজেই সেই ছেলের কাছে যায় এবং বলে, তুমি যতগুলো উট দিতে চাচ্ছিলে, এখন কি তা দেবে? তখন সেই যুবক বলে, এখন তো আমি পঞ্চাশটি উট দেবো। এভাবে দর কমতে কমতে দশটি উটে গিয়ে বিষয় ঠেকে। সে কিছু একটা চাইত; অপরপক্ষ বলত, ঠিক আছে, আমি এটাও দেবো না। তখন সে বলত, ঠিক আছে, তাহলে এতটুকু দিয়ে দাও। ক্রমাগতভাবে দরপতন ঘটতে থাকে আর অবশেষে বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, উয়াইনা বলে, এই বৃদ্ধাকে আমার কাছ থেকে বিনামূল্যেই নিয়ে যাও। এতে যুবকটি বলে, মহানবী (সা.) তো প্রত্যেক বন্দিকে মুক্ত করার পাশাপাশি পোশাকও দিয়েছেন, এই বৃদ্ধা তো তা থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। তাই তুমি তাকে পোশাকও দাও। উয়াইনা বলে, আমার কাছে তো কিছুই নেই, আমি তো আগে থেকেই অত্যন্ত দরিদ্র; আমি লোভ করেছিলাম, আর তাতেও মার খেয়েছি। কিন্তু যুবকটি ছিল নাছোড়বান্দা; সে বলে, কিছু হলেও তোমাকে দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত উয়াইনাকে তার নিজের চাদর দিয়ে দিতে হয় আর এভাবে সেই যুবক সেই বন্দি মহিলাকেও নিয়ে যায় এবং সাথে পোশাকও। যেতে যেতে উয়াইনাকে সে এটাও বলতে থাকে, তোমার মস্তিষ্ক বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা থেকে একেবারেই শূন্য। সুযোগের সদ্ব্যবহার করার যোগ্যতা তোমার মধ্যে একেবারেই নেই। তার অন্যান্য সাথিও তাকে তিরস্কার ও ব্যঙ্গ করতে থাকে। লোভের পরিণামে তার কিছুই অর্জিত হয় নি।

বনু হাওয়াযিনের নেতা মালিক বিন অওফের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে লেখা আছে, মহানবী (সা.) বনু হাওয়াযিনের প্রতিনিধিদলকে তাদের নেতা মালিক বিন অওফ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, সে কোথায় আছে। তখন তারা জানায়, সে তায়েফে বনু সাকীফের মাঝে আছে। তিনি (সা.) বলেন, তাকে জানিয়ে দাও, সে যদি আমার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে ফিরে আসে তাহলে তার পরিবার-পরিজনও তাকে ফেরত দেওয়া হবে, যারা বন্দিদশায় ছিল। কতক বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি (সা.) তার পরিবার-পরিজনের সম্পর্কে এই বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তাদেরকে যেন দাস-দাসী হিসেবে কাউকে দেওয়া না হয় এবং তাদের থাকার ব্যবস্থা মক্কায় উম্মে আবদুল্লাহ্ বিনতে আবি উমাইয়ার বাড়িতে করা হয়। তারা তার কাছে তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ পৌঁছায় এবং সে তাঁর (সা.) কাছে আসার জন্য তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু বনু সাকীফকে সে এই কারণে ভয় পায় যে, যদি তারা জানতে পারে, সে মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে যাচ্ছে, তাহলে আবার তারা তাকে বন্দি না করে ফেলে! তাই সে একটি ঘোড়া ও উট প্রস্তুত করে এবং রাতের অন্ধকারে তায়েফ থেকে বেরিয়ে জিরানায় মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে যায়। আর তিনি (সা.) তাকে তার পরিবার-পরিজনও ফিরিয়ে দেন এবং একশত উটও উপহার হিসেবে প্রদান করেন। তাঁর (সা.) ক্ষমা ও অনুগ্রহ দেখে সে মুসলমান হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সারা জীবন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে জীবন কাটায়। মহানবী (সা.) পরবর্তীতে তাকে হাওয়াযিন গোত্রে মুসলমানদের শাসক এবং

তাদের সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এ সেই মালিক বিন অওফ ছিল যে সমস্ত বনু হাওয়াযিন, সাকীফ এবং অন্যান্য গোত্রকে মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার মানসে একত্র করে নিয়ে এসেছিল। সে মহানবী (সা.)-এর রক্তের পিপাসু ছিল। কিন্তু তাঁর (সা.) আদর্শ এবং ক্ষমা ও মার্জনার উৎকর্ষ হলো, তিনি (সা.) তার সত্যগ্রহণ ও হিদায়াত লাভের বাসনা লালন করতেন। আর যখন সে হিদায়াতের প্রত্যাশী হয়ে আসে, তখন তিনি শুধু সবকিছু ক্ষমাই করে দেন নি, বরং তাকে সেই যুগের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ অর্থাৎ একশত উটও দান করেন।

এই যুদ্ধের বন্দিদের মাঝে একজন মহিলা শায়মাও ছিলেন। এটা ছিল তার উপনাম, তার আসল নাম ছিল হুযাফা। তিনি যখন বন্দি হন, তখন যারা বন্দি করেছিল তাদেরকে তিনি বলতে থাকেন, আমি তোমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর দুধ বোন। কিন্তু সাহাবীরা তা মানেন নি। আনসারের একটি দল তাকে ধরে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত করে। তিনি বলেন, হে মুহাম্মদ (সা.)! আমি আপনার দুধ বোন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, (এ কথার প্রমাণস্বরূপ) কোনো চিহ্ন আছে কি? তিনি দাঁতের চিহ্ন দেখিয়ে বলেন, শৈশবে একবার আপনাকে কোলে নিয়ে রাখা অবস্থায় আপনি আমাকে কামড়ে দিয়েছিলেন। এরপর ঘটনা হয়ত তাঁরও (সা.) মনে পড়ে থাকবে। তিনি আরো বলেন, আমরা তখন ছাগল চরাতাম এবং আপনার দুধ পিতা আমার আপন বাবা আর আপনার দুধ মাতা আমার আপন মা। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! স্মরণ করুন, আমি আপনার জন্য ছাগলের দুধ দোহন করতাম। তিনি (সা.) এসব চিহ্ন দেখে চিনতে পারেন এবং তিনি উঠে দাঁড়ান আর তার জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়ে বলেন, এর ওপর বসো। তিনি (সা.) তাকে স্বাগত জানান এবং তাঁর (সা.) চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে এবং তিনি সেই দুধ পিতা-মাতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জানান, তাদের ইন্তেকাল হয়ে গেছে। তিনি (সা.) বলেন, যদি তুমি ভালো মনে করো তাহলে আমাদের কাছে অবস্থান করো; তুমি সম্মান, সমাদর ও ভালোবাসা পাবে। আর যদি তুমি তোমার গোত্রের কাছে ফিরে যেতে চাও, তাহলে আমি তোমার ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সম্মান রক্ষা করব, তুমি সেখানে চলে যেতে পারো। তখন সে বলে, আমি আমার গোত্রের কাছে ফিরে যেতে চাই। যাহোক, পরে সে ইসলাম গ্রহণ করে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে তিনজন দাস ও একজন দাসী দান করেন এবং একটি বা দুটি উট দেবার আদেশ দেন। সেই সময় তিনি (সা.) হুনাইন এলাকায় ছিলেন, তাই তিনি (সা.) বলেন, তুমি জিরানায় চলে যাও এবং তোমার গোত্রের সঙ্গে থাকো, আমি তায়েফ যাচ্ছি। এরপর তিনি জিরানায় চলে আসেন। মহানবী (সা.) জিরানায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাকে আরো কিছু ছাগল ও ভেড়া দান করেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.) তাকে বলেন, যা চাইবে তা তোমাকে দেওয়া হবে এবং তুমি যে সুপারিশ করবে তা গ্রহণ করা হবে। তখন সে তার গোত্র বনু সা'দ-এর এক ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করে যার নাম ছিল বাজাদ। সে ব্যক্তি এক মুসলমানকে হত্যা করে তার দেহ পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সাহাবীরা তাকে ধরে ফেলেন। পরে যখন শায়মা তার জন্য ক্ষমার সুপারিশ করেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে ক্ষমা করে দেন। তবে বিস্তারিত বর্ণনা নেই, সম্ভবত তিনি পরবর্তীতে তার রক্তপণ ইত্যাদি আদায় করেছিলেন। আবু দাউদের রেওয়ায়েত অনুযায়ী, জিরানা নামক স্থানে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দুধ মা-ও তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বলে উল্লেখ আছে। তবে বলা হয়, এই রেওয়ায়েতের সনদ দুর্বল; দুধ মায়ের সাক্ষাৎ লাভ হয় নি। হতে পারে, দুধ মায়ের সাক্ষাৎ অন্য কোনো উপলক্ষ্যে হয়ে থাকবে অথবা বর্ণনাকারী ভুল করে থাকবেন। কেননা

বেশিরভাগ রেওয়ায়েত অনুসারে, হুনাইনের যুদ্ধের আগেই মহানবী (সা.)-এর দুধ মায়ের মৃত্যু হয়েছিল।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন তখন মক্কাবাসী ঘোষণা দিয়েছিল, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে আনবে তাকে ১০০টি উট পুরস্কার দেওয়া হবে। এই ঘটনা প্রসিদ্ধ এবং বহুবার বর্ণিত হয়েছে। এই ঘোষণা শুনে সুরাকা বিন মালিক রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পিছু ধাওয়া করে এবং তাঁর কাছে পৌঁছে যায়, কিন্তু সে সময় অলৌকিকভাবে আল্লাহ্ তা'লা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে রক্ষা করেন এবং সুরাকা অসহায় হয়ে পড়ে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাকে বলেছিলেন, হে সুরাকা! সেই সময় তোমার কী অবস্থা হবে, যখন কিসরার কঙ্কণ তোমার হাতে শোভা পাবে? তখন সুরাকা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে একটি নিরাপত্তানামা লিখে দেবার আবেদন জানিয়েছিল। সুরাকা সেই নিরাপত্তানামা নিয়ে জিরানায় উপস্থিত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। এ সময় হযরত উমর (রা.)-র একটি মানতের কথার উল্লেখও পাওয়া যায়। হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! অজ্ঞতার যুগে আমি মানত করেছিলাম, একদিন মসজিদে হারামে ইতিকাফ করব। এ বিষয়ে আপনার নির্দেশনা কী? রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যাও এবং তোমার মানত পূর্ণ করো। তখন হযরত উমর (রা.) গেলেন এবং নিজের মানত পূর্ণ করলেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তখনো জিরানায় ছিলেন। এক রাতে তিনি (সা.) উমরা করার মানসে জিরানা থেকে মক্কা যান। রেওয়ায়েত অনুযায়ী, তিনি (সা.) রাতের বেলা যান এবং সেই রাতেই আবার ফিরেও আসেন। লোকেরা বুঝতেই পারে নি, তিনি (সা.) কোথাও গিয়েছিলেন, কেননা তিনি (সা.) অল্প সময়ের জন্যই গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর মদীনায় ফেরার সময় সম্পর্কে লেখা আছে, যুল-ক্বাদা মাসের তখনো ১২ দিন বাকি ছিল আর দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার ,রসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এর পূর্বে তিনি (সা.) হযরত আত্তাব বিন আসীদকে মক্কার শাসক নিয়োগ দেন এবং মহানবী (সা.) তাদের সাথে হযরত মুআয বিন জাবাল ও হযরত আবু মূসা আশআরীকে রেখে যান, যেন তারা লোকদের কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করেন। মহানবী (সা.) কিছু পশু নিজের সঙ্গে এজন্য নিয়েছিলেন যেন পথিমধ্যে যাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে তাদের দান করতে পারেন। তিনি (সা.) জিরানা উপত্যকা থেকে যাত্রা শুরু করে সারফ হয়ে মাররুয যাহরানে পৌঁছান এবং নয় দিন সফরের পর তিনি মদীনায় আগমন করেন। যুল-ক্বাদা মাসের তিন রাত তখনো বাকি ছিল। এই সব অভিযান– মক্কা বিজয়, হাওয়াযিন বিজয় এবং তায়েফবাসীদের ওপর অভিযান মিলিয়ে মোট দুই মাস ১৬ দিন সময় ব্যয় হয়েছিল। প্রাচ্যবিদরা মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধ এবং তায়েফ অভিযান সম্পর্কে আপত্তি তোলে। যদিও প্রাচ্যবিদরা আপত্তিকর কোনো বস্তুনিষ্ঠ বিষয় পায় নি, তবে তাদের দু-একটি আপত্তি এমন রয়েছে যা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তাই আমিও সেগুলো বলে দিচ্ছি। অধুনা যুগের জনৈক প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম মন্টগোমরি ওয়াট বলেন, কয়েকজন নারী ব্যতিত যাদেরকে জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের প্রদান করা হয়েছিল, বাকি সমস্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও বন্দিদের হযরত মাসউদ বিন আমর গিফারী (রা.)-র তত্ত্বাবধানে জিরানায় রাখা হয়েছিল। একইভাবে স্যার উইলিয়াম ম্যুর লেখেন, বন্দিদের মধ্যে থেকে তিনজন সুন্দরী নারীকে মহানবী (সা.)-এর নিকট আনা হলে তিনি (সা.) তাদের মধ্যে একজন হযরত আলী (রা.), একজন হযরত উসমান (রা.) এবং একজন হযরত উমর (রা.)-কে প্রদান করেন। হযরত উমর (রা.) তার অংশে প্রাপ্ত নারীকে নিজের ছেলে হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.)-কে দান করেন। বাকি দুইজনের বিষয়ে সঠিক জানা যায় না, তাদের ক্ষেত্রে

কী করা হয়েছে। যাহোক, এ প্রসঙ্গে তিনি মহানবী (সা.)-এর জীবনী লিখতে গিয়ে লিখেছেন, এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর জীবনীর একটি অন্তর্নিহিত জ্ঞান লাভ হয়। অর্থাৎ তিনি (সা.) সেসব ব্যক্তিকে এমন বন্দি নারীদের দান করেছিলেন, যাদের মধ্যে একজন তার স্ত্রীর পিতা এবং দুইজন তার মেয়ের স্বামী তথা জামাতা ছিলেন। অর্থাৎ তিনি স্বজনপ্রীতি করেছেন, আগেই দিয়ে দিয়েছেন। তিনি আপত্তির ছলে বা দুষ্কৃতিমূলকভাবে একটি ঘটনা উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এর কারণ হলো, হুনাইনের যুদ্ধের সময় বন্দিদের এই ধরনের বণ্টন এবং দাসীদের এভাবে দেবার যে কথা রয়েছে, তা সীরাতে হালবিয়া বা তাবাকাত ইবনে সা'দ-এ পাওয়া যায় না। তবে সম্পদের বণ্টনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাবাকাত ইবনে সা'দ-এ লেখা আছে, সেদিন মুসলমানরা ছয় হাজার বন্দি লাভ করেছিল। মুশরিকরা তখন ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি মানুষের মাঝে সর্বোত্তম। আপনি আমাদের ধনসম্পদ, নারী ও শিশুদের বন্দি করেছেন। তিনি (সা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, যার কাছে এদের কিছু আছে এবং সে যদি তা স্বেচ্ছায় ফেরত দিতে সম্মত হয়, তবে তা হবে সর্বোত্তম। আর যে এ বিষয়ে সম্মত হবে না, সে আমাকে দিয়ে দিক; এটি আমার কাছে ঋণ হিসেবে থাকবে এবং যখন আমি কিছু পাবো তখন এই ঋণ পরিশোধ করব। তখন তারা সবাই বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা একমত এবং তা মেনে নিচ্ছি। মহানবী (সা.) তখন বলেন, আমি জানি না, সম্ভবত তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ থাকতে পারে যে একমত হবে না; যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে। তাই তোমরা তোমাদের প্রতিনিধি পাঠাও যারা আমার কাছে এটি উপস্থাপন করবে। তখন মহানবী (সা.)-এর নিকট একটি প্রতিনিধিদল এসে ঘোষণা করে, তারা এ বিষয়ে সম্মত রয়েছে।

ইতিপূর্বে হুনাইন যুদ্ধের বন্দিদের ব্যবস্থাপনা এবং তাদের মুক্তির ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর দয়ার্দ্র কর্মপন্থা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের আলোকে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। স্যার উইলিয়াম ম্যুর এ বিষয়ে খুব ভালোভাবেই অবগত আছেন। তাই তিনি আপত্তিজনক ভঙ্গিতে লিখলেও শেষ পর্যন্ত সত্য প্রকাশ না করে পারেন নি। হুনাইনের সকল বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল– তার এ বক্তব্য তার নিজের আপত্তিকে খণ্ডন করে। এই যুদ্ধের ঘটনাবলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রথমদিকে বন্দিদের তত্ত্বাবধানের জন্য সাহাবীদের কাছে রাখা হয়েছিল, কিন্তু এটাও স্পষ্ট যে, সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার পর অবশেষে তাদের সবাইকে হযরত মাসউদ বিন আমর গিফারীর তত্ত্বাবধানে জিরানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর যখন তায়েফ থেকে ফেরত এসে তিনি (সা.) হাওয়াযিন গোত্রের সাথে আলোচনা করেন তখন তিনি (সা.) বিশেষ কৃপাসুলভ প্রজ্ঞার সাথে প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত বন্দির মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। পূর্বে যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে তাতে এসব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি।

বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ মন্টেগোমারি ওয়াট এই সত্য সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবহিত। কেননা তিনি এই স্থলে লেখেন, মনে হয় মুহাম্মদ (সা.)-এর (তিরোধানের) দীর্ঘকাল পর শ্রোতারা এসব গল্পে টিকাটিপ্পনি যোগ করেছে। অথবা এটাও হতে পারে যে, এই গল্প কল্পিত, বানোয়াট। আরেকটি আপত্তি মারগুলিস তায়েফের নেতা মালিক বিন অওফ নাসরী সম্পর্কে করেছে; অর্থাৎ মালিক বিন অওফকে নাকি বলপূর্বক মুসলমান বানানো হয়েছিল। মারগুলিসের এই আপত্তি একেবারেই ভিত্তিহীন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সীরাত সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের প্রচলিত আচরণেরই একটি দৃষ্টান্ত। এই রহমাতুললিল-আলামীনের দয়ার

ঘটনাকেও ঘৃণ্যভাবে বল প্রয়োগের রূপ দেওয়া হয় যার সাথে বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক নেই।

এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সীরাত ইবনে হিশামে বিদ্যমান। যখন হযরত রহমাতুললিল-আলামীন (সা.) হাওয়াযিনের প্রতিনিধিদলের আবেদন মঞ্জুর করে তাদের বন্দি ও ধনসম্পদ তাদেরকে ফেরত দেন, তখন যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) তায়েফে অবস্থানরত নেতা মালিক বিন অওফের কথাও বিবেচনা করেন। তিনি (সা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমাকে মালিক বিন অওফের ব্যাপারেও বলো। তার অবস্থা কী? নিবেদন করা হলো, সে সাকীফের সাথে তায়েফে অবস্থান করছে। এতে পুনরায় মালিক বিন অওফের ক্ষেত্রে তাঁর কৃপার প্রকাশ ঘটে। তিনি (সা.) বলেন, তাকে গিয়ে সংবাদ দাও, যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার পরিবার ও ধনসম্পদ তাকে ফেরত দেওয়া হবে। কেবল এতটুকুই নয়, বরং তাকে একশ উটও দেওয়া হবে। এখানে এ বিষয়টি মনোযোগের দাবি রাখে। মহানবী (সা.) বিজেতা ছিলেন, মালিক বিন অওফের কাছ থেকে কোনো সুবিধা আদায় বা স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রশ্নই আসে না। আর কোনো আইনের অধীনে মালিক বিন অওফের ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র কোনো দায়বদ্ধতাও ছিল না। তিনি নিজের চিরন্তন দয়ার আবেগে তাকে ইসলাম গ্রহণ করার বার্তা পাঠান এবং তার পরিবার-পরিজনকে ফেরত এবং ধনসম্পদ ও উট দান করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। অপরদিকে সম্ভবত মালিকের হৃদয়েও পূর্বেই ইসলাম স্থান করে নিয়েছিল। যখন সে তাঁর এই বার্তা পেল তখন তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল; তায়েফ থেকে রওয়ানা হয়ে জিরানা অথবা মক্কায় তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাৎ করল। তখন মালিক মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তিনি (সা.) তাকে তার পরিবার ও ধনসম্পদ এবং অতিরিক্ত একশটি উট দান করেন আর সে ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলাম গ্রহণ করার সময় সে কিছু পঙ্‌ক্তিও আবৃত্তি করে যার মাঝে একটি পঙ্‌ক্তি ছিল– مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِمِثْلِهِ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ بِمِثْلِ مُحَمَّدٍ – আমি সব মানুষের মাঝে মুহাম্মদ (সা.)-এর ন্যায় কোনো ব্যক্তিকে দেখি নি, কিংবা তাঁর মতো মর্যাদাবান কোনো ব্যক্তির কথা কখনো শুনি নি। এগুলো ছিল হুনাইনের যুদ্ধের বিশদ বিবরণ। পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ্ অবশিষ্ট যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে আলোচনা হবে।

এখন আমি দুইজন মরহুমের উল্লেখ করতে চাই, পরবর্তীতে তাদের জানাযাও পড়াবো। প্রথমজন হলেন মুকাররম ডাক্তার লাইক আহমদ ফররুখ সাহেব, তিনি কানাডায় বসবাসরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি বহু বছর আফ্রিকায় ওয়াকেফে যিন্দেগী ডাক্তার হিসেবে সেবা প্রদান করেছেন। সম্প্রতি তিনি তিরাশি (৮৩) বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম মূসী ছিলেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে সহধর্মিণী, এক পুত্র ও দুই কন্যা রয়েছেন। মজলিস নুসরত জাহাঁর অধীনে ১৯৭৪ সালে তাকে ঘানায় পাঠানো হয়। ১৯৭৮ পর্যন্ত সেখানে সেন্ট্রাল হাসপাতালে সেবা প্রদান করেছেন। তার ওয়াকফের তিন বছর পূর্ণ হবার পর অসুস্থতার কারণে তিনি ছুটি চাইলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে আরো এক বছর কাজ করতে বলেন। বড়ো বড়ো জটিল সমস্যা তার কাছে আসত। কিছু কিছু রোগী তিনি অন্য সরকারী হাসপাতালে নেবার জন্য পরামর্শ দিতেন। কিন্তু রোগীরা বলত, যদি চিকিৎসা করাতে হয় তাহলে আহমদী হাসপাতালে এবং আহমদী ডাক্তারের কাছেই চিকিৎসা করাবো। এমন অনেক সফল অস্ত্রোপচার করেছেন যা সফল হবার কোনো আশাই করা যেত না। যাহোক, এমনই একটি

কঠিন সমস্যা স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া নিয়ে একজন রোগী এসেছিল, যার তিনি চিকিৎসা করেন। অনেক জটিল রোগ ছিল। তিনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেন, আল্লাহ্ তা'লা (অপারেশন) সফল করেন। ১৯৮৪ সালে তাকে পুনরায় আফ্রিকার গাম্বিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিল। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে ওয়াকফ হিসেবে কাজ করেন আর ওয়াকফের প্রকৃত চেতনার সাথে সেবা করেন। তার ছেলে লিখেছেন এবং যথার্থই লিখেছেন যে, তিনি অত্যন্ত নীরব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। দোয়াকারী, বিনয়, প্রজ্ঞা এবং ধৈর্য ও অবিচলতার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। সারা জীবন মানবসেবায় অতিবাহিত করেছেন। ওয়াকফের সময়, বিশেষ করে গাম্বিয়ার ছোটো ও পশ্চাৎপদ গ্রাম আঞ্জোয়ারায় অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি ছিল। খাবারও পাওয়া যেত না, তীব্র গরম, তার ওপর বিদ্যুৎ, পানি কিছুই ছিল না; এমন পরিস্থিতিতেও তিনি সেবা করে গিয়েছেন। তিনি বলেন, আমিও অসুস্থ ছিলাম আর আমার পায়ে ফোসকা বের হতো। এমতবস্থায় তিনি আমাকে কোলে করে স্কুলে নিয়ে যেতেন। গাড়িতে বসিয়ে স্কুলে নামিয়ে আসতেন। কখনো অভিযোগ করেন নি। এরপর বলেন, আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের বিষয় ছিল যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৮ সালে সেখানে সফর করেন, তখন বিশেষভাবে আমাদের বাড়িতে যান। ঘরে বসার মতো চেয়ারও ছিল না। কিন্তু হুযূর তাকে বলেন, আমি আপনাদের সাথে খাবার খাবো। বাকি সব স্টাফদের বলেন, তোমরা বাহিরে যাও। তিনি বলেন, এটি আমাদের জন্য অনেক বড়ো সম্মানের বিষয় ছিল। লাহোরে চাকুরিকালে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা শোনাতেন যে, একবার আমার রক্তচাপ কমে যায় আর আমি টেবিলে শুয়ে পড়ি। আমার মনে হচ্ছিল, আমি মরে যাব। [ডাক্তাররা কখনো কখনো নিজেদের বিষয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, কারণ তাদের সেই বিষয়ের জ্ঞানও থাকে।] কিন্তু এরই মধ্যে তিনি আওয়াজ শুনতে পান, 'এখনো সময় আসে নি, কানাডা যাবার পর সময় আসবে'। তিনি বলছেন, এর অনেক বছর পর আল্লাহ্ তা'লা উত্তমরূপে এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন।

১৯৭৮ সালে তিনি যখন ঘানা থেকে ফেরত আসেন তখন তার জামা'তের প্রতিনিধিদল খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-র সাথে সাক্ষাতের জন্য যায়। খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে দেখে বলেন, তুমি ফেরত চলে এসেছ? আমি পুনরায় তোমাকে সেখানে পাঠাবো যেখান থেকে তুমি এসেছ। তিনি বলেন, আমি বুঝতে পারি নি, কেননা আমি পুনরায় ওয়াকফ করছিলাম না। কিন্তু ১৯৮৩ সালে রাবওয়ার সেক্রেটারি নুসরত জাহাঁর পত্র পেলাম যে, তোমার পদায়ন বিবেচনাধীন রয়েছে, তাই চলে আসো। ১৯৮৪ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে পুনরায় আফ্রিকার গাম্বিয়ায় পাঠান। তিনি বলেন, এটি আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়; আমার জন্য এটি নিদর্শন ছিল যে, একজন খলীফা একটি কথা বলেছেন, অপরজন তা পূরণ করেছেন।

ঘানার প্রাক্তন আমীর মরহুম ওয়াহাব আদম সাহেব বলতেন, ডাক্তার সাহেব কোনো রোগীর সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি দেখলে তৎক্ষণাৎ নফল পড়তে আরম্ভ করতেন। তার ঘানায় অবস্থানকালীন সময়ে আমিও (হুযূর) সেদেশে থেকেছি, তার সাথে সময় অতিবাহিত করেছি। আমি তাকে দেখেছি– তিনি অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী এবং মানুষকে সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি ছিলেন। ওয়াকেফে যিন্দেগীদের অনেক সম্মান করতেন। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন, বরং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তাদের মাঝে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল যা খুব কম লোকের মাঝেই পাওয়া যায়।

দাউদ হানিফ সাহেব, যিনি বর্তমানে জামেয়া আহমদীয়া কানাডার প্রিন্সিপাল, একসময় তিনি গাম্বিয়া জামা'তের আমীর ছিলেন; তিনি বলেন, মরহুম সর্বদা মানবসেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। দিন ও রাতের তারতম্য করতেন না; শুধু দেখতেন– কেউ বিপদে বা কষ্টে আছে কি-না; আর যদি দেখতেন, সঙ্গে সঙ্গে তার সাহায্যে ছুটে যেতেন। যে এলাকায় তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেখানে হাসপাতালটি ছোট্ট ছিল। সেখানে যেতে হলে দুটি ফেরি পার হতে হতো। তার বাসস্থানও ছিল এক পুরনো, পরিত্যক্ত স্টোরঘর; সেটি পরিষ্কার করে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে থাকেন। সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না, পানিও ছিল না, টেলিফোনও ছিল না। কূপ বা নদী থেকে নিজেকেই পানি সংগ্রহ করতে হতো। আলোর জন্য মোমবাতি বা লণ্ঠন ব্যবহৃত হতো। সার্জারি সাধারণত দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় করতেন। অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি তিনি রান্নার চুলার আগুনে জীবাণুমুক্ত করতেন। এই কঠিন পরিবেশেও তিনি চিকিৎসাসেবা দিয়ে গেছেন। আজকাল কোনো ডাক্তারকে এমন পরিবেশে কাজ করতে বলা হলে হয়ত তারা কল্পনাই করতে পারবে না– কেমন করে এটি সম্ভব! একবার তার অবস্থানকালীন সময়েই এক রাতে চোরেরা একটি বাড়িতে ডাকাতি করে। লোকজন হইচই আরম্ভ করে এবং চোরদের ধরে ফেলে; তখন চোরদের একজন নিজের 'কাটলাস' তথা তরবারি সদৃশ একটি অস্ত্র বের করে একজনকে আঘাত করে, ফলে তার মাথায় গুরুতর জখম হয়। সঙ্গে সঙ্গে রাতেই ডাক্তার সাহেবকে ডাকা হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ টর্চলাইট ও মোমবাতির আলোতেই তার অস্ত্রোপচার করেন– যা আজকের দিনে কল্পনাতীত, আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অপারেশন সফল হয়, রোগী বেঁচে যায়।

আরেকবার এক গরিব মানুষ ডাক্তার সাহেবের কাছে এসে বলে, আমার গ্রাম অনেক দূরে, কোনো যাতায়াতের ব্যবস্থা নেই। আমি রোগীকে আনতে পারছি না; আপনি দয়া করে গিয়ে দেখে আসুন। ডাক্তার সাহেব তখনই তার সঙ্গে রওয়ানা হন, রোগীকে দেখে চিকিৎসা করেন এবং সে সুস্থ হয়ে যায়। উক্ত এলাকার সংসদ সদস্য যখন এ ঘটনার খবর পান, তখন তিনি নিজে এসে ক্লিনিকে ডাক্তার সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর থেকে যখনই সেই এমপি আসতেন, তার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করতেন এবং বলতেন, সত্যিকার অর্থে মানবসেবা আপনারাই করছেন! আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও করুণা প্রদর্শন করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন, তার স্ত্রী-সন্তানদের স্বীয় নিরাপত্তার মাঝে রাখুন এবং তাদেরকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা ভারতের হায়দ্রাবাদ নিবাসী হামীদ আহমদ গওরী সাহেবের; তিনিও সম্প্রতি ৭৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার সহধর্মিণী, এক কন্যা ও চার পুত্র রয়েছেন, নাতি-নাতনিরা রয়েছে। তার সব সন্তানই কোনো না কোনোভাবে জামা'তের সেবায় নিয়োজিত। তিনি নাযেরে আলা কাদিয়ান ইনাম গওরী সাহেবের ছোটো ভাই এবং আলবেনিয়া জামা'তের মুবাল্লিগ ও প্রেসিডেন্ট সামাদ গওরী সাহেবের পিতা ছিলেন।

তিনি নিয়মিত নামায ও রোযা পালনকারী ছিলেন, তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন এবং মুখস্থ করার চেষ্টা করতেন। যতদিন সুস্থ ছিলেন, নফল নামায শেষ করে ফজরের আগে পাড়ার আহমদী বাড়িগুলোতে গিয়ে কড়া নেড়ে নামাযে যেতেন এবং লোকজনকে ফজরের নামাযের জন্য ডাকতেন। হজ্জ ও উমরা পালনের সৌভাগ্যও তার হয়েছিল। খিলাফতের নির্দেশের প্রতি

সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন, আর যত ছোটো বা যত বড়ো নির্দেশই হোক না কেন– সবসময় চেষ্টা করতেন, আমি নিজে আগে তা পালন করব; যেহেতু তিনি জামা'তে খুতবাও দিতেন তাই বলতেন, আমি আগে নিজে আমল করব, তারপর জামা'তকে বলব। এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি এক্ষেত্রে সফলও ছিলেন।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও করতেন, বাড়িতে হোমিও ঔষধের বিরাট ভাণ্ডার রাখতেন আর রোগীদেরকে বিনামূল্যে ঔষধও দিতেন। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও অগ্রগামী ছিলেন।

এক নিকটাত্মীয় বলেন, আমার হিস্যায়ে আমদ-এর চাঁদা কিছুটা বকেয়া পড়ে যায়। মরহুম সেক্রেটারি মাল সাহেবের কাছে যান এবং নিজে আমার পক্ষ থেকে সেই বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে দেন আর আমাকে সতর্ক করে বলেন, আগামীতে যেন আর চাঁদা বকেয়া না হয়, শুরুতেই চাঁদা আদায় করবে। আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ছিলেন এবং বার বার নিকটাত্মীয়দের নিজের বাড়িতে একত্র করতেন এবং তাদের দুঃখ ও আনন্দ ভাগ করে নিতেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এবং মুবাল্লিগদের অনেক সম্মান করতেন। হায়দ্রাবাদের নায়েব আমীর, সেক্রেটারি তা'লীমুল কুরআন এবং নিজ হালকায় জামা'তের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, আনসারুল্লাহ্র নাযেমও ছিলেন, দক্ষিণ ভারতের নায়েব সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ হিসেবেও সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। যাহোক, জামা'তের অনেক সেবা করার সুযোগ হয়েছে তার। এখানকার জলসাতেও একবার অংশগ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন। তার ছেলে, যিনি আলবেনিয়ার মুবাল্লিগ সিলসিলাহ, তিনি পিতার জানাযায় অংশ নিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা তাকেও ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। যাহোক, পরবর্তীতে তার জানাযার নামায পড়াবো।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)